আমেরিকার ছোটোগল্প

নির্বাচিত গল্প সংকলন

ভাষান্তর

সুজাতা পান্থী সরকার

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

গল্পের আমেরিকা

বিষ্ণু বসু

এক মনীষী একবার বলেছিলেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভাজন ঘটেছে ইংরেজি ভাষার মারফত। জাতে, স্বাদে ও প্রকরণে ইংল্যান্ডের ইংরেজি ও আমেরিকার ইংরেজির মধ্যে তফাত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যাঁরা দূরের পাঠক তাদের কাছে ফলটা বরং ভালোই হয়েছে। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি বেড়ে উঠেছে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। সে তুলনায় আমেরিকার ইংরেজির বয়স মাত্র দু-তিন শতক। ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যখন ইউরোপের বাইরের মহাদেশে উপনিবেশ বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন তার গোড়ার দিকে উত্তর আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্ত এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই রাষ্ট্রটিতে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ও রাষ্ট্রব্যবস্থাটি সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল। তাই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলোর তুলনায় আমেরিকান ইংরেজিতে লেখা সাহিত্য, বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা এবং গভীরতায় অনন্য হয়ে উঠতে পারল।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশ হলেও আয়তনে মহাদেশের তুল্য। শুধু ভৌগোলিক পৃথকত্বের জন্য নয় অধিবাসীদের জীবনযাপন ও অর্থনীতির বিবিধ ভিত্তি তাদের মননে মৌলিকত্ব ও নিবিড়তা দিয়েছে। স্থিতিশীল , গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল আমেরিকান সাহিত্য ও

শিল্পকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। সত্যিই এ পরিবেশ ইংল্যান্ডের ইংরেজির তুলনায় আমেরিকান সাহিত্যের ইংরেজিকে পৃথক করে দিয়েছে।

আমরা এখানে আমেরিকান সাহিত্যের মধ্যে ছোটোগল্প ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ আলোচনায় যাব না। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন ছোটোগল্প প্রসারতা ও গভীরতা পেতে পারে সমাজব্যবস্থার অনুকূল বিন্যাসের পর্যায়ে। আমেরিকার সমাজ তাকে সাহিত্যরচনায় সে পরিবেশ দিয়েছিল।

আমেরিকার সমাজ কাঠামোকে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে ধরে নেওয়া যায়। আমেরিকাকে গত দু-তিন শতক ধরে নির্মাণ করেছেন যারা তাঁরা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী নন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তথা আগত বিচিত্র মানব সম্প্রদায়। তাদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু সংস্কৃতির প্রবল চাপে তাঁদের ভাষা ইংরেজি ভাষা হতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য তা আমেরিকান ইংরেজি। এদের প্রায় সকলকেই দুটো সংস্কৃতিকে বহন করে চলতে হয়েছে ও হচ্ছে। সাংস্কৃতিক এ বর্ণসংকর আমেরিকাকে ঋদ্ধ করেছে।

সব সাহিত্যের অন্যবিধ প্রকরণগুলোকে আলাদা করে রেখে যদি শুধুমাত্র আমেরিকান ছোটোগল্পগুলোর দিকেও মনোযোগ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে বিষয় বৈচিত্র্য ও রচনার নিপুণতা তাদের বিশিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাহিত্যতাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী আধুনিক স্বভাবসম্মত যথার্থ ছোটোগল্প প্রথম লেখা হয়েছিল উনিশ শতকে এবং তা আমেরিকায়। এ বিষয় শিরোপা দেওয়া হয়ে থাকে এডগার অ্যালান পো-কে। আকারে ছোটো হবে এবং গল্প হবে এমন রীতি মেনেই। শুধু তাই নয়, আধুনিকতার যাবতীয় অসুখকে স্বীকরণ করে নির্মিতির অমোঘ কৌশল বিকীর্ণ হয়েছে অ্যালান পোর গল্পগুলিতে, সংখ্যায় যা বেশি নয়। তারপর চলে আসেন অনেকেই যাদের মধ্যে প্রধান হলেন ফ্রান্সের মোপাসাঁ, রাশিয়ার চেকভ এবং আমেরিকারই ও হেনরি। এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। ভূপ্রকৃতি ও মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিটি গহন ও বিস্তারে ছোটোগল্প তার সন্ধানী আলো ফেলে চলেছে।

এরমধ্যে— আমেরিকার ছোটোগল্প শুরু থেকেই অবিশ্বাস্য স্বাতন্ত্র্যকে স্পর্শ করেছে।

এ সঙ্কলনে যাঁদের গল্প গৃহীত হয়েছে সকলেই বিশ্বখ্যাত উনিশ ও বিশ শতকের লেখক। আমেরিকার ভূপ্রকৃতি বহু বৈচিত্র্যে ভরা। আমেরিকার চরাচর, তার মনুষ্য সমাজ, দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়ার পরিধি এবং অন্বেষার ব্যাপকতা স্বভাবতই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। তাই এ-পরিবেশে যেসব ছোটোগল্পকার আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের লেখা গল্পে অজস্রমুখী স্বভাবধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। অ্যালান পো-র গল্প বাস্তবতার যে স্তরকে স্পর্শ করে তা আমদের দৈনন্দিন চেনা জগৎ নয়, তা সামান্য পরাবাস্তব। আবার জ্যাক লন্ডন যে ভুবনে বিচরণ করেন তা আমাদের পরিচিত হলেও বেশ খানিকটা কঠোর ও নির্মম। কৌতুকে-বিষাদে পরিশ্রুত ও হেনরির গল্প পাঠকদের তৃপ্ত করে চলেছে। এই পরম্পরাই দুই শতাব্দী ধরে বহমান হয়ে আছে। আছেন ন্যাথানিয়েল হর্থন, শেরউড আন্ডারসন, হাওয়ার্ড ফার্স্ট এবং আরো অনেকে। আমেরিকার গল্প সাম্রাজ্য থেকে মাত্র একটি গল্পসংকলনে তার বিস্তৃতিকে অবশ্যই অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনও তো করা যায়। এ সংকলনকে তারই নমুনা হিসেবে পাঠকদের কাছে পেশ করা হল। পাঠক অবশ্যই বুঝে নিতে পারবেন মার্ক টোয়েনের সহজ স্থিত জীবন দৃষ্টি। হেমিংওয়ের নির্মোহ প্যাশান, কল্ডওয়েলের কল্পজগতের বিষণ্ণ হেমন্তের জাদুবিস্তার এবং এবং আরও বহুবিধ বৈচিত্র্য পরিবেশিত গল্পগুলোর মাধ্যমে।

সূচিপত্র

মহান পাথুরে মুখ	ন্যাথানিয়েল হথর্ন ১৩
কালো বেড়াল	এডগার অ্যালান পো ৩১
বেহালাবাদক	হেরম্যান মেলভিল ৪৩
নারী অথবা বাঘিনি	ফ্র্যাংক আর স্টকস্টোন ৫৩
ভাগ্য	মার্ক টোয়েন ৬৩
লাক ও রোরিং ক্যাম্প	ব্রেট হার্ট ৭১
লাল সর্দারের মুক্তিপণ	ও হেনরি ৮৫
অন্ধকারে এমন হাঁটা	স্যামুয়েল হপকিন্স অ্যাডমস্ ৯৭
মেরুপ্রভার কন্যা	জ্যাক লন্ডন ১০৯
কারণটা জানতে চাই	শেরউড অ্যান্ডারসন ১২৩
দারুণ ছিলে	ডরোথি পার্কার ১৩৫
সাদা কুটীর	উইলিয়াম ফকনার ১৪১
একজন পাঠিকা যখন লেখে	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১৫১
জাদু চোঙ	বার্নাড ম্যালামুড ১৫৫
সদর্থক ভাবনার শক্তি	হাওয়ার্ড ফার্স্ট ১৭৯
অ্যাগনেস, সবাই তোমাকে দেখছি	এর্সকিন কল্ডওয়েল ১৮৯
হিচহাইকার	রোয়াল্ড ডাহল ১৯৭
একটি পুরোনো অভিধান	লিডিয়া ডেভিস ২০৯
আমরা আমেরিকাবাসী	ডাইনে উইলিয়ামস ২১৫
ওয়েল্ডিকে চিঠি	জো ওয়েন্ডারয়োথ ২১৯

মহান পাথুরে মুখ

ন্যাথানিয়েল হথর্ন (1804–1864)

নাথানিয়েল হথর্ন বহু বিখ্যাত ছোটোগল্পের রচয়িতা। তাঁর লেখায় আছে এক শৈল্পিক রোমান্টিকতা। বহুসময় যা প্রথাগত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রাধান্য দেয় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। তাঁর গল্পগুলির অন্যতম দি বার্থ মার্ক, র‍্যাপ্যাচিনিস ডটার, দি অ্যাম্বিশাস গেস্ট ইত্যাদি। গল্পসংকলন — টোয়াইস টোল্ড স্টোরিজ, মোজেস ফ্রম অ্যান ওল্ড ম্যানস, দি স্নো ইমেজ অ্যান্ড আদার টোয়াইজ-টোল্ড স্টোরিজ। এছাড়াও লিখেছেন চারটি রোমান্স। দি স্কারলেট লেটার, দি হাউস অব দ্য সেভেন গ্যাবেলস্, দি ব্লিদডেল রোমান্স, দি মারবেল ফাউন এবং অসংখ্য অন্যান্য রচনা। ম্যাসাচুসেটস-এর সালেমে যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন, এখন সেটি জাদুঘর।

একদিন বিকেলবেলা।

দিনের সব কাজ সাঙ্গ করে সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়। ঠিক তখনই এক মা কুটিরের দরজায় বসে গল্প শোনাচ্ছে তার ছোট্ট ছেলেকে — দারুণ এক পাথুরে মুখের গল্প। চোখ তুলে তাকাতেও হয় না। বহুদূর থেকে সহজেই দেখা যায় সেই মুখ। মুখের প্রতিটি রেখা জ্বলজ্বল করছে পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয়।

কী সেই পাথুরে মুখ?

অনেকগুলো পাহাড়ের মাঝখানে বড়োসড়ো এক উপত্যকা। অনায়াসে সেখানে বাস করে কয়েক হাজার মানুষ। কেউ থাকে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি কুটিরে। তাদের চারপাশে খাড়া, কঠিন কালো পাহাড়। আবার কেউ বাস করে আরামদায়ক খামারবাড়িতে। তারা পাহাড়ের ঢালে বা উপত্যকার সমতল কালো মাটিতে ফসল ফলায়। অন্যরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছে বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোতে। সেখানে ওপর থেকে নেমে আসা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীকে বশ মানিয়ে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে পোশাক তৈরির কারখানা। এই উপত্যকায় হরেক রকম মানুষের বাস। তাদের জীবনধারা ও জীবিকাও নানারকম। ছোটো থেকে বড়ো, এদের সকলের মধ্যে মিল একটাই — এরা সবাই প্রকৃতির আশ্চর্য উপহার এই মহান পাথুরে মুখকে নিজের প্রতিবেশীর থেকেও ভালো করে চেনে।

প্রকৃতি তার আশ্চর্য খেয়ালে পাহাড়ের মাথায় মস্ত এক পাথরে খোদাই করে রেখেছে এই অনুপম ভাস্কর্য।

একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে দেখলে মনে হয়, এর সাথে বুঝি কোনো মানুষের মুখের সাদৃশ্য আছে। পাথরটা এমন জায়গায় সমকোণে দাঁড়িয়ে আছে, উপত্যকার যে কোনো জায়গা থেকেই চোখে পড়বে। যেন কোনো বিশাল দৈত্য মগ্ন হয়ে

ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তুলেছে এই মূর্তি। অন্তত একশো ফুট লম্বা মুখটার কপালে চওড়া ভাঁজ। নাকটায় একটা বড়ো সেতু। আর বিশাল ঠোঁটদুটো যদি কথা বলতে পারত শোনা যেত বজ্রনির্ঘোষ। উপত্যকায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুনতে পেত সবাই। খুব কাছ থেকে দেখলে দৈত্যের মতো এতবড়ো মুখটার রেখাগুলো সব হারিয়ে যাবে। এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথর ছাড়া নজরে আসবে না কিছুই। কিন্তু কয়েক পা পিছনে গেলেই ফুটে উঠবে সেই অপূর্ব মূর্তি। ঠিক যেন মানুষের মুখ। তাতে স্বর্গীয় বিভা। আকাশে ভেসে থাকা মেঘ আর পাহাড়ে জমে থাকা বাষ্প আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে তাকে।

এখানকার শিশুরা বড়ো হয়ে ওঠে, পুরুষ বা নারীতে পরিণত হয় চোখের সামনে এই দারুণ পাথুরে মুখ দেখতে দেখতে। এর আকৃতি এমনই মহান এবং অভিব্যক্তি এত চমৎকার ও মধুর মনে হয় উষ্ণ হৃদয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছে সমস্ত মানুষকে। তার পরেও জায়গা আছে। এর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাই একটা শিক্ষা। অনেকে বিশ্বাস করে এ মূর্তির সদয় দৃষ্টিপাত আছে বলেই এই উপত্যকা এত উর্বর। এখানে সূর্যকিরণে সোনা ফলে।

আমরা যেমন শুরু করেছিলাম — এক মা তার কুটিরের দরজায় বসে এই মূর্তিটি দেখতে দেখতেই ছেলেকে গল্প বলছিল ... সেই ছেলেটির নাম আর্নেস্ট।

দৈত্যের মতো বিশাল মূর্তিটি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সে তার মাকে বলছে,

'মা, এ যদি কথা বলতে পারত তাহলে এর চেহারার মতোই সুন্দর করে কথা বলত। কোনোদিন যদি এমন কারও দেখা পাই, যাকে ঠিক এইরকম দেখতে দেখো মা, তাকে খুব ভালোবাসব।'

মা বলছে, 'যদি পুরোনো ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয় তাহলে আজ বা কাল কোনো না কোনোদিন তেমন মানুষের দেখা আমরা পাবই। যার মুখ অবিকল ওই মূর্তিটার মতো।'

খুব আগ্রহ নিয়ে ছেলে বলল, 'কীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী মা, আমাকে বলো। সবকিছু বলো।'

অগত্যা মা যখন আর্নেস্টের মতো ছোট্টটি ছিল যে গল্পটা তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল সেটাই শুরু করল।

এটা অতীতের গল্প নয় ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাই।

একটি অতি পুরোনো গল্প। ভারতীয়রা আগে যখন এই উপত্যকায় বাস করত তারা শুনেছিল তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তাদের বলেছিল ঝিরঝির করে

বয়ে যাওয়া নদীর স্রোত। গাছের মাথার ওপর দিয়ে ফিশফিশ করে চলে যাওয়া বাতাস। যার সারমর্ম হল একদিন একটি শিশু জন্ম নেবে যে তার সময়ের সবচেয়ে মহান এবং উদার মানুষ হবে। এটাই তার নির্ধারিত ভাগ্য। আর, বয়সকালে সে দেখতে হয়ে উঠবে এই মূর্তিটারই মতো। কেবল পুরোনো বয়স্করা নয়, তরুণরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে — একথা একদিন ফলবেই। কিন্তু কিছু মানুষ যারা এই পৃথিবীটাকে অনেক বেশি দেখেছে, দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে আজকাল ভাবছে, তাদের এই প্রতিবেশীর থেকে মহান আর কেউ জন্মাবে না, যার মুখটা হবে এরকমই। এসব অলস মনের কল্পনা। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত তেমন মানুষের দেখা পাওয়া যায়নি।

মাথার ওপরে দু'হাত তুলে বলে ওঠে আর্নেস্ট, 'মা, মাগো, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই তেমন কাউকে ঠিক দেখতে পাব। দেখো তুমি।'

তার মা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও বিবেচক। ছোটো ছেলেটির বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত হবে না বুঝেই তাকে নিরাশ না করে বললেন, 'হয়তো তার দেখা তুমি পাবে।'

আনের্স্ট কখনও ভোলেনি মা'র বলা সেই গল্প। যখন তাকিয়েছে সেই মূর্তির দিকে মনে মনে ভেবেছে, একদিন সত্যি হবেই ...।

যে গাছের গুঁড়ির কুটিরে সে জন্মেছিল সেখানেই কেটেছে তার ছোটোবেলা। মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করেছে। তাঁর সেবা করেছে। ছোটো ছোটো হাত দিয়ে তাকে সাহায্য করেছে যতটা সম্ভব। সবসময়েই তার হৃদয় জুড়ে আছে নিষ্পাপ ভালোবাসা। পাহাড়ি হাওয়ার মতো আন্তরিকতা।

এইভাবেই সুখী চিন্তামগ্ন শিশুটি একদিন হয়ে উঠল মৃদুভাষী, শান্ত এক বালক। তার রোদে পোড়া বাদামি চামড়া, খেতে কাজ করা কর্মঠ দুটো হাত। কিন্তু তার বুদ্ধির দীপ্তি হার মানায় বহু নামকরা স্কুলে পড়া ছাত্রকেও। আর্নেস্টের কোনো শিক্ষক নেই কেবল মহান পাথুরে মুখ ছাড়া। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে সে যখন তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মূর্তির দিকে, তার মনে হয় সে তাকে চিনতে পেরেছে। করুণার হাসি হেসে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তখন শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে তার। কেউ হয়তো ভাববে — এটা ভুল। সারা পৃথিবীকে যেভাবে দেখে মূর্তি, সেইভাবেই চেয়ে থাকে আর্নেস্টের দিকে। কিন্তু রহস্য এটাই — বালকের কোমল হৃদয় আর সরল বিশ্বাস ওই মূর্তির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে অনেক কিছু। যা অন্যেরা পায় না।

এমন সময় উপত্যকায় গুজব শোনা গেল এতদিন পর সেই মহান মানুষের দেখা পাওয়া গেছে। যে হুবহু ওই মূর্তিরই মতো।

অনেকদিন আগে এখানকারই একজন, ভাগ্যের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিল দূরের এক সমুদ্র বন্দরে। টাকায়পসা জমিয়ে সেখানেই একটা দোকান খোলে সে। সাফল্যের কারণে সবাই তাকে ডাকে 'স্বর্ণমুদ্রা মশাই' বলে। লোকটির ওপর ভাগ্যের অশেষ করুণা। কিন্তু সে নিজে পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিত হল অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী বলে। বহর সমেত একটা বড়ো জাহাজের মালিক। পৃথিবীর নানা প্রান্তের দেশ হাত বাড়িয়ে দিল এই মানুষটির সম্পদ তিলে তিলে বাড়িয়ে উঁচু পাহাড়চূড়ায় নিয়ে যেতে। উত্তরের শীতল মেরুদেশ তাকে উপহার পাঠাল পশম। আফ্রিকা তাকে দিল তার নদীর সোনালি বালুকণা আর গহন অরণ্যে বেড়ে ওঠা হাতির দাঁত। পশ্চিম থেকে এল কাজ করা শাল, মশলা, চা, খনি গহ্বরের হিরে ও সমুদ্রের বিশুদ্ধ বড়ো মুক্তো। মহাসাগরও খালি হাতে ফেরল না তাকে। তেল বিক্রি করে যে লাভ সে পেল তা অভূতপূর্ব। সবাই বলে ধুলো তার মুঠিতে সোনা হয়ে যায়। মিডাসের মতোই কোনো কিছু সে স্পর্শ করলে তৎক্ষণাত তা চকচক করে, হলুদ হয়ে ওঠে, তারপরই পরিণত হয় ধাতুতে — পয়সার পাহাড়। একদিন এত ধনী হয়ে উঠল তার পয়সা গুনতেই বোধহয় কেটে যাবে একশো বছর। এই সময় স্থির করল — এবার ফিরে যাবে নিজের গ্রামে। যেখানে সে জন্মেছে। তাঁর মতো পয়সাওলা মানুষের থাকবার যোগ্য প্রাসাদ তো চাই! সুতরাং সেখানে এল পৃথিবীর সেরা স্থপতি।

তার বাবার ভেঙে পড়া খামার বাড়িটার পাশে যখন বিশাল অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াল উপত্যকার মানুষের মনে আর কোনো ধন্দ রইল না — যে মানুষের জন্য এতদিন তারা হাপিত্যেশ করে বসে আছে, এতদিনে সে আসছে। সেই পাথুরে মুখের সঙ্গে এই মানুষের মুখ যে মিলে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঝকঝকে সাদা মারবেলের আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ। সূর্যের আলো লাগলেই যেন গলে যাবে। ছেলেবেলায় তার আঙুলগুলো যখন এমন জাদু শেখেনি, তখন সাদা বরফ দিয়ে এমন প্রাসাদই তৈরি করত সে। লম্বা থামের ওপর অপূর্ব কারুকাজ করা বারান্দা। অগণিত দরজা। তাতে রুপোর হাতল। দরজার চিত্রবিচিত্র কাঠ আনা হয়েছে সমুদ্রের ওপার থেকে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বড়ো বড়ো জানালার কাচ এত স্বচ্ছ মনেই হয় না দাঁড়িয়ে আছি ঘরের মধ্যে। যেন উন্মুক্ত প্রকৃতি আর বদ্ধ ঘরের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। প্রাসাদের ভেতরে যাবার অনুমতি কারও নেই। তবে খবর পাওয়া গেছে অন্দরমহল নাকি বাইরের চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর। অন্যান্য বাড়িতে যা লোহা আর পেতল দিয়ে তৈরি — এখানে